আড্ডা ....

নজমুস সাকিব

নোটিশ ঃ আড্ডা প্রবাসী বাঙালী জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্দ্য অংগ। রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কিছু নেই যেটা আলোচনা হয় না আড্ডায়। জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও মতামতের সাথে অনুমান ও আবেগভিত্তিক তথ্য ও মতামতের ছড়াছড়ি থাকে সেখানে। জীবনের এই জলছবিকে ধরার জন্যে বর্তমান ধারাবাহিক গল্পের অবতারণা। এর চরিত্রগুলো কাল্পনিক। চরিত্রগুলোর মতামত সাধারণ মানুষের মতামত – পণ্ডিতের গবেষণালব্ধ মতামত নয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে ভুল ও সঠিক তথ্যপ্রবাহ কিংবা প্রপাগাণ্ডার প্রভাবে গল্পের চরিত্রগুলোর মতামত বদলায়, যেমন বদলায় জীবনের রং।

আজ ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০২। ঘুম থেকে উঠেই মামুনের মনটা খারাপ হয়ে গেলো সালাউদ্দিন চৌধুরীর কথা মনে করে। ৩৮ বছরের গভীর কালো চোখের সেই ছেলেটা কেমন এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলো গতবছর এই দিনে। ১০৩ তালায় উইন্ডোজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডে কাজ করতে গিয়েছিলো সালাউদ্দিন ঘরে আসন্নপ্রসবা বউ আশরাফীকে রেখে। আর ফিরেনি সে। দু'দিন পরে ৮ পাউন্ড ১০ আউন্সের ফারকাদ চৌধুরী জন্ম নিলো জন্মএতিম হয়ে। বাপের মতো গভীর কালো চোখ নাকি পেয়েছে ছেলেটা। মামুনের সাথে সালাউদ্দিন আর আশরাফীর শেষ দেখা বাল্টিমোরে ৭-৮ বছর আগে, এক পারিবারিক ডিনারে। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন তখন তাদের দু'জনের চোখে। হায় স্বপ্ন ! আওড়ে উঠলো মামুন নিজের মনেই ।

মামুন চোখ বুলালো তার ক্যালেন্ডারে। দু'টো ক্লায়েন্ট মিটিং আছে আজ। তাছাড়া সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় যেতে হবে সাক্রামেন্টো ইন্টারফেইথ সার্ভিস ব্যুরোর সেপ্টেম্বর ১১ স্মরণসভায়। অতএব প্রেসিডেন্ট বুশের সন্ধ্যে ছটার বক্তৃতা শোনা হবেনা মামুনের। কাল নীরাকে ফোন করে জেনে নেয়া যাবে এর সারমর্ম, কেননা আজ ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে মনট্রিয়লে, ভাবলো মামুন।

হ্যালো নীরা, ওপারে ফোনটা তুলতেই মামুন কোমল স্বরে অভিবাদন জানালো।

–হ্যালো – নীরার মিষ্টি গলা ভেসে এলো ইথার তরঙ্গে- কেমন আছো মামুন?

-ভালো, মামুনের সংক্ষিপ্ত উত্তর। নীরা জিজ্ঞেস করলো - গতকাল তোমার ইন্টারফেইথ সার্ভিস ব্যুরোর স্মরণসভা কেমন হলো। মামুন কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে বললো -যতটা ভালো হবে আশা করেছিলাম, ততটা ভালো হয়নি। দশ ডলার টিকিট কেটে অনেক লোক এসেছিলো- খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইহুদি, ও বৌদ্ধ। আরো এসেছিলেন গবর্ণরের বউ, কংগ্রেসমেনরা ও এ,বি,সি, টিভির খবরপাঠকপাঠিকা। কিন্তু অনুষ্ঠানটি আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। তা প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তৃতা কেমন শুনলে নীরা?

একটু ঢোক গিলে নীরা উত্তর দিলো - ভালো বক্তৃতা, ভেরি ওয়েলরিটেন, - অনুপ্রাণিত করবে তোমার দেশের লোকদের, কানাডার শান্তিপ্রিয় লোকদের নয়। মামুন জিজ্ঞেস করলো - মুসলমানদের নিয়ে কিছু বললো নাকি? নীরা সরাসরি কোওট করলো বুশের বক্তৃতা থেকে - We respect the faith of Islam, even as we fight those whose actions defile that faith. We fight, not to impose our will, but to defend ourselves and extend the blessings of freedom. মামুন ঠাট্টা করলো -মুসলমানদের খুশী করার জন্য কেবল এইটুকুন, ব্যাস ! আর কিছু নয়?

নীরা তার গলা সিরিয়াস করে বললো- ঠাট্টা রেখে সত্যি করে বলো ত' সেপ্টেম্বর এগারোর এক বছর পূর্তির মাথায় তোমার দেশ আমেরিকায় মুসলমানদের আসল অবস্থা কি।

মামুন মাথা চুলকিয়ে খুব দুশ্চিন্তার ভাব করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো– এরকম একটা লোডেড প্রশ্ন করে বিপদে ফেললে আমায়।– অতীব কঠিন প্রশ্ন। আমার কি যোগ্যতা আছে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার।

নীরা কপট রাগ দেখিয়ে ধমকে উঠলো– চুপ করো! পরমুহূর্তেই নিজেকে শুধরে নিলো– না, চুপ করো না। তোমার তো ঐতিহাসিক উপন্যাস বলার ছাড়পত্র আছেই। অতএব আমেরিকার মুসলমানদের একটা ইতিহাস-নির্ভর কাহিনীই না হয় শুনাও।

মামুন বলতে শুরু করলো– তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটু কথা ধার নিয়ে শুরু করতে পারি, যদি অভয় দাও।

নীরা বললো– নো প্রবে-ম।

রবিঠাকুর ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রিলিজিয়ন অব ম্যান নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। সেখানে বলেছিলেন 'জ্যোতির্বিদ দূরবীণ নিয়ে জ্যোতিস্কের পর্যালোচনা করতে চান, কিন্তু তার বাধা বিস্তর। আকাশে আছে পৃথিবীর ধুলো, বাতাসের আবরণ, বাষ্পের অবগুণ্ঠন, চারদিকে নানা প্রকার চঞ্চলতা। যন্ত্রের ত্রুটিও অসম্ভব নয়; যে মন দেখছে, - তার মধ্যে আছে পূর্বসংস্কারের আবিলতা। ভিতর–বাহিরের সমস্ত ব্যাঘাত নিরস্ত করলে বিশুদ্ধ সত্য পাওয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সত্য এক, কিন্তু বাধাগ্রস্ত প্রতীতির বিশেষত্ব অনুসারে ভ্রান্তমত বহু।' এই যদি হয় বিজ্ঞানের অবস্থা, তাহলে বুঝতেই পারো সমাজ, সভ্যতা, ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ সত্যকে খুঁজে পেয়েছি বলাটা যে কতবড় বোকামি। কেননা এসকল বিষয়ে তাবৎ জ্ঞানই ইতিহাসভিত্তিক অর্থাৎ তা নির্ভরশীল ব্যাখ্যা ও বিচারবিবেচনার উপর। এর মানে এই নয় যে এসব বিষয়ে তথ্য নেই কোনো। কিন্তু সেই তথ্য দিয়ে কি ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব খাড়া করা হলো তার উপরে নির্ভর করে তথ্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা। আমি এখন যা বলবো তারও সীমাবদ্ধতা এইখানেই।

মামুন একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো– আমেরিকাতে মুসলমানরা যে খুব ভালো ছিলো আগে তা নয়, তবে সেপ্টেম্বর ১১ এর পর তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মূলত: চারভাবে তারা আক্রান্ত হচ্ছে– এক, শারীরিকভাবে- হামলা, হুমকি, অপমান ও কটু মন্তব্যের শিকার; দুই, মানসিকভাবে– শত্রুভাবাপন্ন মিডিয়ার নানা রকমের বিদ্বেষময় প্রচারণা মুসলমানদেরকে আমেরিকা, ইউরোপ, সারা দুনিয়া, তথা আধুনিকতার শত্রু বলে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছে; তিন, ব্যক্তিগতভাবে - সব মুসলমানই সন্দেহের শিকার এখন, তাদের উপর রয়েছে এফ.বি.আই এর চোরা নজর; এবং চার, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে - ইসলামকে একটি পশ্চাদপদ, যুদ্ধংদেহী, ও যৌনতাড়িত ধর্ম হিসেবে অপপ্রচারে দল বেঁধে লেগেছেন বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী।

প্রথম তিনরকমের আক্রমণকে না হয় সামলানো যায়। কেননা সময়ের সাথে তার মাত্রা ও সংখ্যা উভয়েই কমে যাবে– কিন্তু চারনম্বরের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ সবচেয়ে বেশী কাবু করেছে মুসলমানদেরকে –কারণ এটা যেন 'আত্মার' উপর আক্রমণ। দেহমনের উপরে আক্রমণ সামলানো গেলেও আত্মার উপরে আক্রমণ সামলানো কঠিন। তাছাড়া এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবও আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক এই আঘাত সামলাতে না পারলে প্রবাসী মুসলমানেরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কি পবিত্র মূল্যবোধ রেখে যাবেন?

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে মামুন কর্ডল্যাস ফোনটা হাতে নিয়ে ঠাণ্ডা পানির জন্য

কিচেনে ঢুকলো।

নীরা বললো– পশ্চাৎপদতার এই অভিযোগটা তা হলে কি নারীঘটিত? মামুন এক ঢোক ঠান্ডা পানি খেয়ে উত্তর দিলো– তুমি ঠিকই ধরেছো। মুসলিম নারীর অবরোধ ও নানারকম জোরজবরদস্তিমূলক আইন এই অভিযোগের একমাত্র কারণ না হলেও প্রধান একটা কারণ। অনেকে আবার খ্রীস্টান, ইহুদি, বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে নানান উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, ইসলাম নারীকে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় বেশী অধিকার দিয়েছে। কিন্তু তত্ত্বগত সে তর্ক বাদ দিয়ে যদি মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকাও, তাহলে দেখতে পাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমান রমণীদের অধিকার কতটা সংকুচিত করে রেখেছে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, ও ব্যক্তি - এই চারশক্তি একজোট হয়ে। একটা ধর্মের নামে মনুষ্যজাতির অর্ধেকের উপর নানারকম বাধানিষেধ আরোপ করলে কিংবা ইতিহাসগত আচারআচরণের অন্ধ অনুকরণ করলে অন্যরা সে ধর্মকে পশ্চাদপদ বললে অবাক হবার কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি– যে জাতি তার অর্ধেক মানবসম্পদের পূর্ণবিকাশে বাধা দিয়ে রাখে, সে জাতির পিছিয়ে পড়াটাইতো স্বাভাবিক। মামুন এই বলে থামলো। বুঝতে পারলো সে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলো। নিজেকে সামলে নিয়ে মামুন আবার বলতে শুরু করলো - মুসলমানরা যদি পশ্চাৎপদতার এই অভিযোগের জবাব দিতে চান, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে নারীকে তাদের নিজেদের ভাগ্যনির্ধারণের অধিকার। এবং মুসলিমদের বেরিয়ে আসতে হবে অতীতমুখীতা থেকে। অতীত গৌরব কিংবা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় কোরানের তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে মুসলিমদের কাজে কর্মে প্রমাণ করতে হবে যে তারা পশ্চাৎপদ নন, তারা চিন্তায় ও কাজে উভয়তঃই আধুনিক।

নীরা মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললো - কিন্তু, পশ্চিমা বিশ্বের দেয়া আধুনিকতার সংজ্ঞার সাথে মুসলিমরা একমত নাওত' হতে পারেন।

মামুন উত্তর দিলো - সংজ্ঞার কূটতর্কে গেলে সবকিছুরই একটা জাস্টিফিকেশন তৈরী করতে পারবে মুসলিমরা, কিন্তু মানুষের উপর মানুষের জোরজবরদস্তির সমর্থন কোন্ যুগের কোন্ দেশের আধুনিকতার সংজ্ঞায় তারা খুঁজে পাবে? কোরানে বলা হয়েছে 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন'– নাই কোন জবরদস্তি, ধর্মের ভিতরে। আয়াতুল কুরসীর যেখানে শেষ, সেখানেই আছে এই বাণী। লক্ষ্যণীয় এই বাক্যের গ্র্যামাটিক্যাল কনস্ট্রাকশনটাও। প্রথম কলেমা 'লা ইলাহা ইল-লল-হ' (নাই কোন উপাস্য, আল-হ ব্যতীত)র মত করে জোর দিয়ে (শুরুতে "লা") বলা হয়েছে এই কথা। কোরানের শুরুও কিন্তু এরকম এক দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায়– জালিকাল কিতাবু, লা রাইবা ফিহি। (এই সেই গ্রন্থ, নাই কোন সন্দেহ এতে)। মনে রেখো নীরা, 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন' বাণীর মর্মকথা সবদেশে সবযুগেই আধুনিক -এর জন্য কোন মানানসই যুগোপযোগী সংজ্ঞা খুঁজতে হয়না।

নীরা বললো– সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু যুদ্ধংদেহী মৌলবাদী ধর্মের অভিযোগ থেকে মুসলমানরা কিভাবে বেরোবে? 'জেহাদ' কে নিয়ে ভয়ানক হৈচৈ চলছে বিশ্বময়। অথচ এই যুদ্ধংদেহী অবস্থানতো সব ধর্মেই আছে। তুমি কোরান থেকে, বাইবেল থেকে বা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ থেকে ধর্মযুদ্ধের বাণী তুলে আনতে পারবে তর্কের খাতিরে। এটা যে কেবল মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত ধর্মের বেলায় সত্য, তা নয়। এমনকি ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের হিন্দু ধর্মেও ধর্মযুদ্ধকে 'স্বর্গদ্বারমপাবৃতম'– (অর্থ: মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ) বলা হয়েছে (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩২নং শে-াক)। কিন্তু কেবল মুসলমানরা কেন এখন এর দায়ভারে দোষী হচ্ছে? নীরা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো। মামুন অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললো - ধর্মযুদ্ধের সংজ্ঞার বিতর্কে না যেয়ে একথা বলব যে, যেকোন ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রসংগের বাইরে উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্মের একটি কঠোর চেহারা বের করে আনা খুবই সহজ। সেই কারণেই যুগে যুগে ধর্মের নামে ঘটেছে কত প্রাণহানি। কিন্তু যুগে যুগে অগণন মানুষের অকারণ প্রাণহানির জন্য কেবল ধর্মকে দায়ী করলে সেটা ফেয়ার হবেনা। ধর্মহীন কম্যুনিজম সোস্যালিজমের নামে সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, ও দক্ষিণ এশিয়ায় কি কম প্রাণহানি ঘটেছে? একটু থেমে মামুন আবার বলতে শুরু করলো – তবে মুসলমানরা 'জেহাদ' বিতর্কের ভালো একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। ডিকশনারি ঘেঁটে তারা বের করেছেন 'জেহাদ' শব্দের মানে হচ্ছে স্ট্রাগল অর্থাৎ সংগ্রাম করা; হত্যা করা নয়। 'ক্বিতালা' মানে হত্যা করা। 'জেহাদ' মানে নিজের রিপুর সাথে নিজের সংগ্রাম। জেহাদের এই শান্তিমূলক ব্যাখ্যা মেনে নিলেও কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন সুযোগমত ধর্মনেতারা এই আত্মরক্ষামূলক অবস্হান ছেড়ে জেহাদের একটি জংগীমূলক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েও দিতে পারেন। ভয়টা যে অহেতুক নয় সেটা তুমি বুঝতে পারবে আমেরিকার মসজিদে গেলে। অনেক মসজিদে জুম্মার নামাজের পর মোনাজাতে মুসলমানদের উন্নতি কামনা, প্যালেস্টাইনের মুক্তি কামনার সাথে থাকে ইহুদী ও নাসারাদের দুর্গতি কামনা, ইসরাইলের ও আমেরিকার ক্ষতি কামনা। আবার মসজিদের পেছনে এফ.বি.আই–এর চর লাগলে হৈ হল-া। অথচ জনপ্রিয়তার খাতিরে ধর্মনেতারা যে কি রকম অবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন তার প্রমাণ পাবে সানফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার শ্বেতাঙ্গ মুসলিম নেতা হামজা ইউসুফের দেয়া বক্তৃতায়। আরভাইনে এক মুসলিম সমাবেশে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার দুইদিন আগে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন আমেরিকার উপর বিশাল একটি দুর্যোগ নেমে আসবে শীগগির, কেননা "..this country stands condemned." ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে তিনি অবশ্য ক্ষমা চেয়েছেন এরকম বিদ্বেষমূলক কথা বলার জন্য। জন্মসূত্রে মার্কিনী ও শ্বেতাঙ্গ না হলে আজ তাকে এর জন্য জেলের ভিতর পচতে হতো। ১৯৯৫ সালে আরেক বক্তৃতায় হামজা ইউসুফ ইহুদী ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিলেন। কোন দেশ, জাতি, বা ধর্মের প্রতি ঢালাও বিদ্বেষই কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের মত নির্বিচার হত্যাকান্ডের সূতিকাগার। হামজা ইউসুফও সেকথা স্বীকার করেছেন ১১ সেপ্টেম্বরের পর। কিন্তু মজার কথা হলো তিনি দোষ চাপিয়েছেন আরবদের ঘাড়ে। "Those are old speeches, .. I've spent 10 years in the Arab world and I've learned their language... Anti-semitism, anti-anything does not reflect my core values." মুসলমানদের সমস্যা এই যে, এরাই তাদের নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট বুশের দর্শন লাভ করেন ও উপদেশ দেন। তাই মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে আরো মজবুত ইন্টেলেকচুয়েলদের সমাবেশ দরকার–যাদের বিশ্ববীক্ষা হাওয়ার সাথে, শ্রোতার সাথে, বদলায় না– যাদের জীবনদৃষ্টি আরো গভীর ও মমতাময়। তাহলেই হয়ত' মুসলমানরা যুদ্ধংদেহীতার অভিযোগ খন্ডাতে পারবেন।

নীরা বললো - এবার বলো দেখি ইসলামকে যে যৌনতাড়িত একটি ধর্মরূপে অপপ্রচার করা হচ্ছে তার উত্তর মুসলমানরা কিভাবে দেবে? আমি জানি, অনেক মুসলমানই এ প্রসংগ এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে এই অভিযোগের সদুত্তর না দিলে বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের ন্যায্য রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধর্মের লেবাস পরিয়ে দিয়ে ট্রিভিয়্যালাইজ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হবে বা হচ্ছে? যেমনটা করা হচ্ছে প্যালেস্টাইনে। মামুন মুচকি হেসে বললো, এই বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের আগে, এটা বহুল প্রচার পায় এর পরে। ২০০১ এর আগস্টের ১৯ তারিখে সি.বি.এস টিভিতে সিক্সটি মিনিট অনুষ্ঠানে প্যালেস্টাইনী 'হামাস' গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি শো হয়। এতে হামাস নেতা আবু ওয়ারদেহকে বলতে শোনা যায় যে সুইসাইড বোম্বারদেরকে বেহেস্তে ৭২ জন কুমারী ভার্যার পুরস্কার লাভের লোভ দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান প্রচারের পর আমেরিকান মুসলিম নেতারা ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপনা করার জন্য সিবিএস এর কাছে এপলজি দাবী করেন। কিন্তু মুসলিম ধর্মনেতাদের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয় এনিয়ে। একদল বলেন যে ৭২ কুমারী ভার্যার পুরস্কারের কথা কোরানে কোথাও নেই। আরেকদল দাবী করেন যে ইবনে কাসিরের তফসীর ও সহীহ সিত্তার (সঠিক ছয়টি হাদিস গ্রন্হ - সুন্নীমতে) অন্যতম তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদিসে একথার উলে-খ আছে এবং কোরানের 'হুরে আয়েন' (অর্থ: কাজল নয়না রমণী) শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেখানে। প্রথম দল তখন তিরমিযী শরীফের ঐ হাদিসের ইসনাদ (সূত্র) নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তুমি নিশ্চয় জান যে কোরান শরীফ নিয়ে কোন বিতর্ক না থাকলেও হাদিস নিয়ে মুসলমানদের

মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতেই অনেক জাল হাদিস তৈরী হয়েছে স্রেফ নিজের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে। যেমন সর্ববিখ্যাত ও সবচেয়ে সঠিক হাদিস গ্রন্থ বলে সম্মানিত বোখারী শরীফের সংকলনকারী ইমাম বুখারী সংগ্রহ করেছেন প্রায় ছয়লক্ষ হাদিস; কিন্তু তার গ্রন্থে সঠিক বলে স্থান পেয়েছে মাত্র সাড়ে সাতহাজার হাদিস। উলে-খ্য যে ইমাম বুখারীর জন্ম হযরত মুহম্মদ (দঃ) মৃত্যুর ১৮০ বছর পর। তারও এগারো বছর পরে জন্ম তিরমিযী শরীফের সংকলক ইমাম তিরমিযীর। সময়ের এই ব্যবধানের কারণে হাদিস নিয়ে তাই সবসময়ই মুসলমানরা ঝগড়াঝাঁটি করেছে। তাই অনেক ধর্মপন্ডিতরা এখন বলছেন ইসলামের অবিতর্কিত সোর্সে –অর্থাৎ কোরানে ফিরে যেতে। এনিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চলছে বিশাল তর্কবিতর্ক। কেননা শরিয়ার অনেক আইনের (যেমন পর্দার) সুস্পষ্ট সমর্থন কোরানে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

নীরা জিজ্ঞেস করলো– ত' কোরান এই ৭২ কুমারী ভার্যার ব্যাপারে কি বলে?

মামুন বললো– এটা সত্যি যে ৭২ কুমারী ভার্যার পুরস্কারের কথা কোরানে কোথাও নেই। কিন্তু রমণীসাহচর্যের কথা বলা হয়েছে বেহেস্তবাসীদেরকে। এ সংশি-ষ্ট আয়াত আছে কোরানের ১২টি সুরাতে। তুমি যদি এসকল সুরার নাযেল হওয়ার সময়ের ক্রম অনুসারে সেগুলোকে সাজাও, তাহলে দেখবে মক্কায় নাযেল হওয়া প্রথমদিককার পাঁচটি সুরাতে সংগীনীর কথা বলা হয়েছে এবং বর্ণনায় কাজল নয়না রমণীর কথাও এসেছে। পরবর্তীতে নাযেল হওয়া সাতটি সুরায় কিন্তু সংগীর বর্ণনার জেন্ডার আর স্ত্রীলিংগ নেই, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে ক্লীব লিংগে, যাকে আমরা বলি স্পাউজ (স্বামী বা স্ত্রী)। বলা হয়েছে 'তুমি এবং তোমার 'আজওয়াজ' (পবিত্র সংগী)' কেননা এখানে 'তুমি'তে পুরুষ ও মহিলা উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন– এটা হচ্ছে কোরানের ইতিহাসগত অনুসংগ–অন্ধকার যুগের আরবদের স্বর্গসুখ বুঝানোর জন্য রূপক কিংবা উপমা দেবার প্রয়োজনে প্রথমে এসেছে 'হুরে আয়েন' (কাজল নয়না রমণী) পরে এসেছে 'আজওয়াজ' (পবিত্র সংগী)। মদ্যপানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞায়ও এই কালগত পর্যায়ক্রমিকতা পাবে। আধুনিক পণ্ডিতেরা আরো বলেন যে রূপক, উপমা, বা কালগত অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে আক্ষরিক অর্থকে ছাড়িয়ে স্বর্গের শ্বাশতঃ বর্ণনাকে গ্রহণ করতে হবে, যার সারকথা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখ। তাদের মতে এই সকল রূপক বাণীর কালোপযোগী ব্যাখ্যা ও বর্ণনার বিস্তার ধর্মান্তরিত মানুষের কল্পনায় নানান গতি ও মোড় নিয়ে স্হান পেয়েছে অনির্ভরযোগ্য অনেক হাদিসে, যার সাথে কোরানের মর্মবাণীর মিল পাওয়া যায় না। যেমন রূপক প্রসঙ্গে কোরানে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থে তোমাদের জন্য দু'রকমের বাণী দেয়া হয়েছে– মুহকামাত (সুস্পষ্ট) ও মুতাসাবিহাত (রূপক) - " তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক। যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।"(সুরা আল ইমরানে, আয়াত ৭) এ প্রসঙ্গে আরেকটা মজার কথা না বলে থাকতে পারছিনা। দু'বছর আগে জার্মান এক পণ্ডিত কোরানের উপর একটি গবেষণগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন–সেখানে তিনি কোরানের বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশে-ষণ করে বলেছিলেন যে হুরে আয়েন শব্দের আসল মানে হচ্ছে সাদা কিসমিস, কাজল নয়না রমণী নয়। তিনশত বার পৃষ্ঠার এই বইয়ের নাম Die Syro- Aramäische Lesart des Koran. –যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'কোরানের সিরীয় আরামিক ভাষার পাঠ'। বইটি হঠাৎ করে খ্যাতি অর্জন করেছে, নিউইয়র্ক টাইমসেও গত মার্চ মাসে এ নিয়ে একটি বিশাল নিবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। হামাসপন্থীরা বলছে–এটা পেন্টাগনের ষড়যন্ত্র, সুইসাইড বোম্বারদের নিরুৎসাহিত করার জন্য ভেজাল গবেষণা। আবার কেউ বলছেন– হ্যাঁ, তাইতো, ফুলের বাগান, আর স্রোতস্বিনী নদীর সাথে সাদা কিসমিস–এই ত' বেহেস্তের বর্ণনা। হুরপরীর গল্প আসলে বানানো।

নীরা হাসতে হাসতে বললো– বা ! বেশতো জবাব বিধর্মীদের অভিযোগের! মামুন বললো– দ্যাখো, তোমাকে এত কিছু বললাম, এটা বোঝানোর জন্য যে কূটতর্ক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না যেয়ে মুসলমানরা যদি কোরানের দিকে ফিরে তাকিয়ে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এর শ্বাশতঃ আদর্শের খোঁজ করে, তাহলে অনুভব করতে পারবে ধর্মের একটি সমগ্রতার বোধকে, একটা অন্তিম সামঞ্জস্যের প্রচেষ্ঠাকে, যেখানে দেখা যায় মহাপুরুষেরা সৃষ্টিকর্তার বাণী নিয়ে এসেছেন সকল মানুষের শান্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য, মানুষের মধ্যে হানাহানি বাড়ানোর জন্য নয়। মোটকথা, আমেরিকার মুসলিমরা যদি তাদের উপর এই বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকে সামলিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে কোন শ্বাশতঃ মূল্যবোধের উত্তরাধিকার রেখে যেতে চান, তাহলে তাদের আচার আচরণে ইসলামের শ্বাশতঃ ও চিরন্তন আদর্শকে স্থান দিতে হবে। হিংসা করোনা, অহঙ্কার করোনা, মিথ্যা বলো না, জোরজবরদস্তি করো না, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, বিনয় করো, গরীব ও অসহায়কে দয়া করো, এই বাণীগুলো নিজের জীবনে তো আগে মেনে চলুন মুসলিমরা, তারপর না হয় ধর্মপ্রচার বা নিজ ধর্মের গুণগান। নিজ সমাজের অন্যায় অবিচারের সংস্কারগুলোকে আগে তাদের বর্জন করা দরকার। তাহলেই হয়ত' আবার শুরু হবে মুসলিমদের আলোর দিকে যাত্রা, সকল জাতি সকল ধর্মের মানুষকে সংগে নিয়েই। সেই অভিযাত্রা আমেরিকান মুসলমানরা যত তাড়াতাড়ি শুরু করবেন, ততই তাদের মঙ্গল। মামুন থামলো। নীরা ঠাট্টার ছলে বললো - তোমার এই WIN WIN থিওরী কি মুসলিমরা পছন্দ করবেন! মামুন চুপ করে রইল। দীর্ঘ ফোনালাপে নীরা ও মামুন দুজনেই ক্লান্ত। আচমকা নীরা তার কণ্ঠস্বর বদলিয়ে নিচু গলায় আবদার জানালো - বহুদিন তোমার আবৃত্তি শুনিনা মামুন, একটা কবিতা শুনাও না।

মামুন প্রথমে চমকে উঠলো। পুরনো স্মৃতির হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে নাড়া দিয়ে গেল তার সমস্ত অস্তিত্বকে। ঢক্ ঢক্ করে এক গ-াস ঠান্ডা পানি খেয়ে নিয়ে নিজেকে সামলে নিলো মামুন। ভরাট গলায় আবৃত্তি শুরু করলো– রবীন্দ্রনাথের কবিতা-

'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে
দয়াহীন সংসারে–
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো–
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির–দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"

একটু থামলো মামুন–মাঝখানের লাইনগুলি মনে করতে পারলো না। কবিতাটির শেষটুকুন মনে এলো–

'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে–
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো?"

নীরা চুপ! মামুন চুপ! আকাশের সমস্ত তারানক্ষত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মামুনের চোখে ভেসে উঠলো একটি নবজাত শিশুর মুখ, অবিকল সালাউদ্দিন চৌধুরীর মত গভীর কালো চোখ তার। ঝাপসা হয়ে আসছে মামুনের চোখদুটো। না আলো, না অন্ধকার, এমনি এক দ্রুতঅপসৃয়মান মুহূর্তের দ্বিধাথরথর চূড়ায় ভর করে এলো যুগ যুগের সেই প্রশ্ন

'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছো ভালো?' ❑

(ক্রমশঃ)

সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্ণিয়া

আমেরিকান কর্পোরেট কালচার
কর্মচারীদের অধিকার

শ্যামল নাথ

আমেরিকায় এখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। শেয়ার মার্কেট সেই যে নিম্নগতিতে চলা শুরু করছে বছর দুয়েক আগে থেকে, তার গতি আবার উল্টোমুখী হবে তেমন কোন সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না। এর মাঝে প্রায় বছর খানেক আগের সেই ঘটনা – সেপ্টেম্বর ১১ - কাটা ঘায়ে নূনের ছিটার মতো, অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো দু'ধাপ নিচে টেনে রেখেছে। অর্থনৈতিক মন্দার সুত্র ধরে চারদিক থেকে আসছে বড় বড় করপোরেট ধ্বংসের খবর। এই তো, Worldcom নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে, সাথে সাথে চাকুরী হারালো তাদের প্রায় ১৭০০০ কর্মচারী। দেউলিয়া ঘোষণা করেছে US Airways। American Airlines ঘোষণা করেছে তারা ৭০০০ কর্মচারী ছাটাই করবে এবং বন্ধ করবে ৭৫৮টি রুটে তাদের বিমান ব্যবসা। IBM নীরবে ধাপে ধাপে কর্মচারী ছাটাই করে চলেছে। এ পর্যন্ত ছাটাই করেছে প্রায় ১৫০০০ কর্মচারী। এই তো মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিলাম, এরকম ঘটনা এখানে সেখানে সর্বত্র। আর এই তো হচ্ছে বড় বড় কর্পোরেটগুলোর চিত্র, আর ছোট ছোট হাজারটা কোম্পানী তো এর মধ্যে সব পাততাড়ি গুটিয়ে নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে।

অর্থনীতির সাম্প্রতিক এই নিম্নগতি, কোম্পানীগুলোর কর্মচারী ছাটাই আর কর্মচারীদের চাকুরী হারানোর মাঝের প্রক্রিয়া এবং ঘটনাগুলো দেখে এবং শুনে মুক্তচিন্তা আর সবার সমান অধিকারের এই দেশের মানুষের কর্মক্ষেত্রের অধিকার নিয়ে মনে দ্বিতীয় ভাবনা জাগছে।

প্রথমতঃ বাজার অর্থনীতির নাম করে কোম্পানীর কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা আর কোম্পানীর এক্সিকিউটিভদের বেতন ভাতার মধ্যে রয়েছে বিশাল অসামঞ্জস্য। অধুনা এখানকার ছোট আর মাঝারী মাপের কোম্পানীর ক্ষেত্রে সিইও এবং সিএফও-দের ব্যবসায়িক সম্মানী হয়েছে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ডলার। পাশাপাশি কোম্পানীর স্টকের একটা ভাল অংশও তারা পেয়েছেন অপ্‌শন হিসাবে। অনেক ক্ষেত্রে সিইওরা এতটাই স্টকের মালিক যে কোম্পানীর স্টক হোল্ডারদের মিটিংয়ে অথবা বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের মিটিংয়ে তাদের ভোটের গুরুত্ব অনেক বেশী। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকমই যে পাবলিক কোম্পানী হয়েও অনেকক্ষেত্রেই এর প্রেসিডেন্ট, সিইওরা ওটাকে পেয়ে যান তাদের প্রাইভেট কোম্পানীর মতোই। যখন তখন নিজিদেরকে মোটা দাগের একটা বোনাস দিয়ে দিতে তাদের কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। সিইওদের বেতনের কথা যখন বলেছি তখন পাশাপাশি তার অন্য কর্মচারীদের বেতনের একটা আন্দাজ দরকার। একজন ভাল মানের বৈজ্ঞানিক এইসব কোম্পানী থেকে বছরে বেতন পান প্রায় একশত হাজার ডলারের মতো। ইদানিংকালের অর্থনৈতিক টালমাটাল আর কোম্পানী ধ্বংসের ঘটনার মাঝে খবর মাধ্যমগুলোতে বেশ কিছু কোম্পানীর সিইও/সিএফওদের কথা বলতে দেখা গেছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কেন তারা এইসব সম্মানিত এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় নিজেরা এত বেশীগুন বেতন পাবার অধিকার রাখেন। তারা উত্তর দিয়েছিলেন- তাদের কাজে রিস্ক অনেক বেশী। রিস্কটা কি? হ্যাঁ, তাদের দায়িত্ব কোম্পানীর ব্যবসার ডিরেকশন ঠিক করা। যদি কোম্পানীর ব্যবসা ফেল করে তার দায়িত্বের বড় অংশই বর্তাবে তাদের ঘাড়ে। ঠিক কথা। কিন্তু ব্যবসা ফেল করার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে বর্তালেও, ব্যবসা ফেল করার মাশুল কি তারা দেন? যতগুলো কোম্পানী তাদের ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে বলে কোম্পানীগুলোকে Downsize করছে, হাজার হাজার কর্মচারী চাকুরী হারিয়েছে, তাদের কতগুলোতে সিইও অথবা সিএফওর চাকুরী গেছে? একজনও নয়। তাহলে ব্যবসা ফেল করার জন্য মাশুল কে দিচ্ছে কোম্পানী এক্সিকিউটিভরা না কি তার কর্মচারীরা? আর রিস্ক? কার চাকুরীতে রিস্ক বেশী?

এতো গেল ক্ষমতা পাওয়া এবং তার সদ্ব্যবহার করে এক্সিকিউটিভদের বড় হবার ব্যাপারটা। সমস্যা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে চৌর্যবৃত্তি একটি। যখন মানুষ বেশী ক্ষমতার অধিকার পায় একচেটিয়া, তখন বড় হবার জন্যে ক্ষমতার স্বাভাবিক ব্যবহারের পাশাপাশি তার অপব্যবহার শুরু করে অতিমাত্রায়। আজকের আমেরিকার অর্থনৈতিক ধ্বংসের একটা বড় কারণ কর্পোরেট এক্সিকিউটিভদের ক্ষমতার অপব্যবহার। একজন স্টক এনালিস্টকে যখন দু'বছরের চুক্তিতে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়- দশ মিলিয়ন ডলারের, শুধুমাত্র একটা কোম্পানীর স্টকের ফোরকাস্ট দেয়ার জন্য; তখন সে ফোরকাস্ট যে এক্সিকিউটিভদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজেই লাগবে সেটা বোঝা কি এতই কঠিন? এক্সিকিউটিভদের চুরির ঘটনার মধ্যে কোম্পানীর টাকায় বিশ মিলিয়ন ডলারের Yatch কিনে সেটা নিজেকে উপহার দেয়া আর ইনসাইডার ইনফরমেশন ব্যবহার করে স্টক কেনা বেচার ঘটনা বেশ উলে-খযোগ্য। দেখে শুনে মনে হয়, সময় এসেছে কর্পোরেট স্ট্রাকচারে কর্মচারীদের অধিকারের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করে দেখার। সিইও/সিএফওরা মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত হন সব কর্মচারী আর স্টক হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করে কোম্পানীকে ঠিকপথে চালিত করার জন্যে। কিন্তু তাদের ক্ষমতার মধ্যে Check and Balance রাখার জন্যে কর্মচারী আর সাধারণ স্টক হোল্ডারদের দরকার আরও বেশী অধিকার যেন সিইওরা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাদেরকে মাশুল দেবার ব্যাবস্থা করা যায়। তাদের চাকুরীর রিস্কটা তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারা দরকার।

কর্মচারীদের অধিকার নিয়ে আর একটা ঘটনার কথা বলি। একটা আন্তর্জাতিক কোম্পানী তাদের মূল প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ আমেরিকাতে আরেকটি ইউরোপে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক মন্দার ছোঁয়া তাদের গায়েও লেগেছে আর তারাও ঘোষণা করেছেন কোম্পানীর শতকরা দশভাগ লোককে কোম্পানী থেকে বিদায় জানানো হবে। লে-অফ ঘোষণা করার দিনেই তাদের আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের বাছাই করা কর্মচারীদের হাতে দিয়ে দেয়া হল পিংক স্‌লি-প- পত্রপাঠ বিদায়। আমেরিকাতে কোম্পানীগুলো কাউকে চাকুরীতে নেবার সময় কন্ট্রাক্টে বলা থাকে কোম্পানী অথবা কর্মচারী একে অপরকে এক মুহূর্তের নোটিশেই বিদায় জানাতে পারে। আমেরিকান অফিসে যদিও একদিনের নোটিশেই কর্মচারীদের পত্রপাঠ বিদায় দেয়া গেল, ইউরোপিয়ান অফিসে কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। ইউরোপিয়ান দেশটির নিয়ম মোতাবেক কোন কোম্পানী কর্মচারীদের লে অফ ঘোষণা করতে চাইলে প্রথমত কর্মচারীদের একটি ইউনিয়ন বানিয়ে তাদেরকে সব এক্সিকিউটিভ তথ্যের অধিকার দিতে হয়। এক্সিকিউটভরা যে ভিত্তিতে লেঅফের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্মচারী ইউনিয়ন সেটা পুংখানুপুংখ বিচার করে তার প্রয়োজনীয়তা যাচাই করবে। দরকার মতো কর্মচারী ইউনিয়ন লে অফের কোন বিকল্প সমাধান বের করা যায় কিনা তার চেষ্টা করবে। এবং যদি কর্মচারী ইউনিয়নও লে-অফকে প্রয়োজনীয় মনে করে তবে তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এক্সিকিউটিভরা ঠিক করবে কোন পজিশনগুলোকে লে অফ করলে কোম্পানী সবচাইতে কম লেঅফ করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারবে। শুনে কি মনে হয় না, আমেরিকান কোম্পানীর কর্মচারীদের চাইতে ইউরোপে কর্মচারীদের তাদের কোম্পানীর দিকনির্দেশনায় বেশী অধিকার আছে। তাহলে, আমেরিকাতে নয় কেন?❑

স্যান দিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া

সেপ্টেম্বর ২০০২।

ক্যালিফোর্নিয়ায় কংগ্রেসপ্রার্থী সৈয়দ মাহমুদ

নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস নির্বাচনে ক্যালিফোর্নিয়ার ১৩তম ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচন পদপ্রার্থী জনাব সৈয়দ মাহমুদ। ১৩তম ডিস্ট্রিক্টের ভিতর পরে অ্যালামিডা, ফ্রিমন্ট, হেইওয়ার্ড, নেয়ার্ক, পে-জেনটন, সান লিয়াড্রো, ইউনিয়ন সিটি, চেরীল্যান্ড, সান লরেঞ্জো এবং যুগেল। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পড়শীর জন্য কিছুটা সময় দিয়েছিলেন। যে রাতে তার সাথে দেখা করার কথা, সেদিন গুজরাটে সন্ত্রাসীরা একটি হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করে প্রার্থনাকারীদের এলোপাথারী হত্যা করে। বাড়ি থেকে বের হবার মুখে কবর পেলাম যে, সৈয়দ মাহমুদ মিলপিটাসে মন্দিরে যাচ্ছেন। উনার সাথে যোগাযোগ করায় বললেন - 'ঘন্টা দেড়েক পরে চলে আসুন - গল্প করা যাবে।'

দেখা হলো চাঁদনী রেস্তোরাঁয়। পৌছে দেখলাম তিনি খেতে বসেছেন - যোগ দিলাম তার সাথে। শুনলাম মন্দিরে এই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন ভারতের এক সন্ত্রাসী ঘটনা শুনে। তিনিও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তি কামনার এই সভায়। সৈয়দ মাহমুদের জন্ম ভারতে - কিন্তু তিনি পরবর্তীতে বাস করেছেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে। বাংলাদেশের লালমনিরহাটে তিনি তার পরিবারের সাথে তিন বছর ছিলেন। পরে চলে যান করাচীতে। ১৯৬৯ সালে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায়, তখন থেকে তিনি এখানেই আছেন। প্রথম জীবনে কাজ করেছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনে। পরবর্তীতে নিজেই একটি ব্যবসা শুরু করেন। সে-ও প্রায় ১৫ বছর হয়ে এলো। তিনি গত ৩০ বছর ধরে এদেশের মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। আলামিডা কাউন্টি রিপাবলিকান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট রিপাবলিকান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও তিনি দুবার মনোনীত হয়েছেন। রিগান ও বুশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া ২০০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট অ্যাসেম্বলীতে ১৮তম ডিস্ট্রিক্টে তিনি রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তাছাড়া ইউনাইটেড মুসলিম অব আমেরিকা নামের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সংস্থায় তিনি প্রেসিডেন্ট। ইস্ট বে'র ইসলামিক সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া রিপাবলিকান পার্টির এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য। ২৮ বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী জারন এবং একমাত্র কন্যা জাহরাকে নিয়ে তার সুখের সংসার। পড়শীর সাথে সৈয়দ মাহমুদের আলাপচারিতা।

পড়শী : প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী এবং পরে নাগরিক হিসেবে অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন না। আপনি কেন হলেন?

মাহমুদ : ১৯৬৯ সালে দেশে আসার পর পরই আমার মনে হয়েছিল যে এই দেশটিতে সুযোগ ও স্বাধীনতা দুটোই খুব আদরনীয় বিষয়। আমি মনে করি দেশ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও অন্যান্য যে কোন বিভেদ নির্বিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা স্বাধীনভাবে চলার, কথা বলার ও জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছি। এ দেশের রাজনীতিতে যারা জড়িত তারাও বিভিন্ন স্তর থেকে আসা এ দেশেরই মানুষ, এদেশেরই অন্যান্যদের প্রতিনিধিত্ব করা যাদের জন্য প্রধান কর্তব্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে যদি কোন দেশে আমি নিজেকে এবং নিজের সম্প্রদায় বা পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই - তাহলে প্রথম কাজই হচ্ছে সেই দেশের রাজনীতির মূলধারায় যোগদান করা। পরিবর্তন আনা সম্ভব শুধু ভিতর থেকে, বাইরে আলাদা হয়ে থেকে নয়।

পড়শী : একজন দক্ষিণ এশীয় এবং মুসলমান হিসেবে কি রাজনীতিতে প্রবেশে আপনার কোন অসুবিধা হয়েছিল?

মাহমুদ : একদমই নয় - বরং উল্টোটা। আমাকে সকলে সবভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এই ব্যাপারে। এই দেশটি গণতন্ত্রের দেশ। জনগণের পছন্দের প্রার্থীই নির্বাচিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। একজন দক্ষিণ এশীয় এবং একজন মুসলমান হিসেবে আমি সব সময়েই এদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করেছি। কিন্তু গণতন্ত্রে শুধু একটি দল বা সম্প্রদায়কে উপস্থাপন করে সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সে জন্যই আমি দেশ, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের এবং এই এলাকার সবার সাথে মিশেছি এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করি বলেই মনে করি।

পড়শী : এই এলাকার মুসলমান ও দক্ষিণ এশীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আপনি কি ধরনের সাহায্য পেয়েছেন?

মাহমুদ : তাদের কাছ থেকে আমি সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু এটা শুধু মুসলমান বলে নয় - বরং সবার কাছ থেকেই আমি সাহায্য পেয়েছি। এখনই আমি ফিরে এলাম মিলপিটাসের মন্দির থেকে। ভারতের গুজরাটে মন্দির হামলার খবরে বিচলিত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন। আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা ভারত উপমহাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য আলোচনা করলাম।

পড়শী : আপনার নির্বাচন প্রচারণার মূল বাণী কি?

মাহমুদ : সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সহমর্মিতা। আমরা এদেশে অনেকেই প্রথম প্রজন্মের কিন্তু এখন দ্বিতীয় প্রজন্মও উঠে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি গণতন্ত্রে আর গণতন্ত্রের শক্তি সহযোগিতা ও সহমর্মিতায়। সাম্প্রতিক ৯/১১ ঘটনার পর এই শান্তি ও শক্তি ভীষণভাবে আহত হয়েছে। আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দেশের বিভিন্ন ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও বর্ণের মানুষের ভিতর সহমর্মিতা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা।

পড়শী : এই এলাকায় অভিবাসীর সংখ্যা অনেক। এদের আপনি কি জানাতে চান?

মাহমুদ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আধুনিক গণতন্ত্র। এদেশ অভিবাসীদের যে রকমের সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান করে এমনটি সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, তাদের অনেকেই মূলধারার রাজনীতি থেকে সরে থাকেন। কোথাও এক হলেই তারা রাজনীতির আলোচনাই করেন - কিন্তু সে রাজনীতি বাংলাদেশের বা পাকিস্তানের বা ভারতের। অথচ অভিযোগ করার সময় তারা যথেষ্ট অভিযোগই করেন। আমার অভিজ্ঞতা বলে যদি আমরা কোন 'সিস্টেম'এ পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে সেই সিস্টেমে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। আমি অভিবাসীদের আহ্বান জানাবো যে আপনারা এদেশের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুন। আপনাদের যে শুধু ডেমোক্রেটিক বা রিপাবলিকান দলে নাম লিখাতে হবে তেমন নয়। এই এলাকায় অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন - যারা নির্বাচিত হচ্ছেন। যদি এই ধরনের রাজনীতি আপনার ভাল না লাগে, তাহলেও উপায় আছে। আপনার ছেলেমেয়েদের স্কুলের কমিটিতে যোগ দেন। যেখানে কাজ করছেন তাদের পরিচালিত

কোন সামাজিক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করুন, প্রতিবেশীদের সাথে আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো যখনই নাগরিকত্ব পাবার জন্য আপনি উপযুক্ত হবেন - সাথে সাথে নাগরিকত্ব গ্রহণ করুন। এবং প্রতিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন।

পড়শী : অভিবাসী হিসেবে আমরা কিভাবে আমাদের সম্পর্ক ও দাবির কথা জানাতে পারি?

মাহমুদ : অনেক উপায় আছে। প্রথমত. যোগাযোগ করুন আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে। আমরা কয়জন জানি এলাকার জনপ্রতিনিধি কে? দ্বিতীয়ত, প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে যোগাযোগ করুন। তারা আপনাদের কথা শুনতে আগ্রহী। তৃতীয়ত, নিজেরা সংগঠিত হন। নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করলে অন্যরা আমাদের কথা শুনবে না। চতুর্থত. সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভাজন থেকে নিজেদের রক্ষা করা। এগুলো আমাদের দুর্বল করে দেয়। বিশ্বাস করুন যে আপনার পক্ষে একজন ভাল মুসলমান হয়েও একজন ভাল সফল আমেরিকান হওয়া সম্ভব। পঞ্চমত. বার বার চেষ্টা করুন প্রতিবেশী, সহকর্মী ও অন্যান্যদের সাথে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে। আপনাদের সমস্যা সমাধানে আপনার এই বন্ধুরাই এগিয়ে আসবে।

পড়শী : ৯/১১ কি মুসলমানদের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ কঠিন করে দেয় নি?

মাহমুদ : একদমই নয়। আমার প্রার্থীতা ঘোষণা করা হয়েছে রিপাবলিকান দল থেকে ৯/১১ এর পরেই। আমি মনে করি এখন আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিবিদরা বরং মুসলমানদের উপর বিশেষ নজর দিচ্ছেন। এখনই সময় এদেশের মূলধারার রাজনীতিতে মুসলমানদের সম্পৃক্ত হবার। এদেশের অভিবাসী নাগরিক হিসেবে মুসলমানদের অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার রয়েছে, শুধু তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই। ৯/১১ আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশের এবং সবাইকে জানানোর যে আমরা আমেরিকান, আমরা এদেশেরই অধিবাসী। এ দেশের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে এখন যা চলছে- তার বিপক্ষে জনপ্রতিনিধিত্বর শিক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদেরই।

পড়শী : ৯/১১র পর একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনার প্রতি মানুষের ব্যবহারে আপনি কি কোন তারতম্য দেখেছেন?

মাহমুদ : হ্যাঁ, দেখেছি। আমাদের প্রধান শত্রু অজ্ঞতা। মানুষ আমাদের মুসলমানদের সম্পর্কে খুবই কম জানে। এবং প্রায়শই প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে ভুল তথ্য জানেন। দোষটা মূলত আমাদেরই। আমরাই নিজেদের গুটিয়ে রেখেছি নিজেদের মধ্যে। আমাদের আসা-যাওয়া, সমস্যা কর্মকাণ্ড নিজেদেরই ভিতর। মূলধারার মার্কিনী সমাজের সাথে আমরা কতটুকু সম্পৃক্ত? কেন তারা আমাদের ভুল বুঝবে না? কিন্তু আমার কথা যে, ৯/১১ র পরে অনেকের কাছ থেকে ভীষণ সহমর্মিতা ও সমর্থনও পেয়েছি। আমি এখানে আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভীষণ আশাবাদী।

পড়শী : আপনি এইমাত্র গণমাধ্যমের কথা বললেন। প্রায়শই এই মাধ্যমগুলোতে একপেশে খবর দেয়া হয়। এর প্রতিকার কি?

মাহমুদ : এর প্রতিকার অংশগ্রহণে। আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এদেরকে ডেকে আনতে হবে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। আমাদের কয়জনের ছেলেমেয়েকে আমরা সাংবাদিকতা পড়তে উৎসাহিত করেছি। শুধু ডাক্তার বা প্রকৌশলী যথেষ্ট নয় - আমাদের হতে হবে সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, ব্যবসায়ী এবং আরো সবকিছু। গণমাধ্যমগুলো সংখ্যা অনুযায়ী অংশগ্রহণ ভিত্তিক মাধ্যম। যাদের অংশগ্রহণ নেই- তাদের কোন উপস্থাপনও নেই।

পড়শী : দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতি আপনার উপদেশ কি?

মাহমুদ : এটি তোমাদের দেশ। এর সবকিছুতে তোমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেদের ধর্ম ও অন্যান্য সামাজিক মূল ভিত্তিকেও তোমাদের বহন করতে হবে। আমি আরো তোমাদের উৎসাহিত করবো, মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে। যখন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছো, তখন আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্লাবগুলোতে অংশগ্রহণ কর। তোমরা চেষ্টা কর কিভাবে এদেশে মানুষ গণতন্ত্র চর্চা করে এবং কিভাবে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন সেটা বোঝার।

পড়শী : মূল রাজনীতিতে ফিরে আসি। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে কি আপনি আপনার দলের ইরাক সম্পর্কিত নীতিগুলো সমর্থন করেন?

মাহমুদ : একটি দলের অংশ বলেই যে আমাদের দলের সব নীতি সমর্থন করতে হবে আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট বুশ জাতিসংঘে যেয়ে ঠিক কাজটি করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি না যে, আমাদের জাতিসংঘের সমর্থন ছাড়া ইরাক আক্রমণ করা উচিত।

পড়শী : আপনার এলাকার কি কি সমস্যা সমাধানে আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন?

মাহমুদ : আমাদের একটি প্রধান সমস্যা স্বাস্থ্য ক্ষেত্র। এইচএমও-গুলো আস্তে আস্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য বীমা সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া এই এলাকায় ছোট ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক মন্দায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ট্রেড সেন্টারে ধ্বস নেমেছে। আমি এই সমস্যাগুলো সমাধানে মনোযোগ দিতে চাই।

পড়শী : পড়শীর পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আপনার কি বলার আছে?

মাহমুদ : এখানে এমন একটি পত্রিকা চলছে জেনে খুব খুশি হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার অনুরোধ আমাকে সমর্থন করার জন্য। আমি সব সময় সবার সাথে কথা বলতে আগ্রহী। এখানে যিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করছেন- তিনি গত তিরিশ বছর ধরে আছেন। এখন সময় হয়েছে পরিবর্তনের। ৯/১১ পরবর্তী সময়ে এই পরিবর্তন আনাতে আপনাদের সমর্থন আমার সফলতায় সাহায্য করবে। ❑

আলাপচারিতা ঃ ফুয়াদ রাহমান

সেপ্টেম্বর ২০০২।

ঘরে বসে নিয়মিত 'পড়শী' পেতে হলে
আজই গ্রাহক হয়ে যান
গ্রাহক ফর্ম–সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন :

www.porshi.com

send your submissions to porshi :

editors@porshi.com

e-fax : 707-988-0328